ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Special Issue, April, 2026, Page No. 01-12
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.specialissue.W.428

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিতায় শহর কলকাতার রূপ

মিহির মজুমদার, *সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রাধাগোবিন্দ বরুয়া মহাবিদ্যালয়, গুয়াহাটি, অসম, ভারত*

Received: 27.03.2026; Accepted: 07.04.2026; Available online: 10.04.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Kolkata is the cultural capital of Bengal. Its heritage spans nearly three centuries. This city of Kolkata is the epicenter of all kinds of social, political, economic, and aesthetic activities of Bengal. People's curiosity and questions about it are endless. Life, livelihood, art, struggles, and aesthetics here have always been subjects of interest. Poets, artists, and painters have all left their mark of diverse talents on the heart of Kolkata. Ignoring the ravages of time, the indestructible essence of this city continues its journey through the ages. Poets and writers of different eras have depicted this city in countless ways. Many proverbial sayings in Bengali poetry have been created about this city. Here, we have focused our discussion on the context of modern Bengali poetry and the city of Kolkata. Poet Nirendranath is a renowned talent of modern Bengali poetry. Our objective is to observe how the city of Kolkata has been expressed in his works. He had a unique love for the city he knew from his youth. He viewed everything in this city with affectionate eyes. In many of his poems, the city of Kolkata has earned a special place of its own. In Nirendranath's early poems, however, the urban life is not so strongly felt. There, a pure romantic focus is observed. In the poems written in his middle age, the panorama of Kolkata begins to appear more prominently. Nirendranath draws our attention with his poetic language. His language is simple. Its significance is sharp and far-reaching. He experimented extensively with the use of rhythm in his poetry. The subject matter of his poetry is the broader human life. It is the craftsmanship of the experiences of diverse people. His focus on the consequences of life is so profound and lucid that it easily startles us. The essence of human life is the soul of his poetry.

Keywords: Kolkata, its politics, culture, modern Bengali poetry, life sketch of kolkata

‘কলকাতা একদিন কল্লোলিনি তিলোত্তমা হবে’।[১] জীবনানন্দের (১৮৯৯-১৯৫৪) এই উক্তি অমরত্ব লাভ করেছে। ইতিপূর্বে মাইকেল মধুসূদন (১৮২৪-১৮৭৩) তাঁর রচিত ‘একেই কি বলে সভ্যতা?’ (১৮৬০) নাটকে বৈষ্ণব বাবাজির কণ্ঠে কলকাতা সম্পর্কে যে উক্তি পেশ করেছেন তাও স্মরণীয় হয়ে আছে। “এ কলকাতা মহাপাপ নগর- কলির রাজধানী, এখানে কি কোন ভদ্র লোকের বসতি করা উচিত?”[২] কবি নীরেন্দ্রনাথের পিতামহ লোকনাথ চক্রবর্তীও অনুরূপ ধারণা পোষণ করতেন। সে-কথা কবি তাঁর ‘রূপকাহিনী’ (১৯৮৪) কাব্যের এক জায়গায় লিখেছেন-

"স্পষ্ট করে বলো দেখি, কী হবে কলকাতায় গিয়ে,
কী লাভ উল্টোপাল্টা বাতাস বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে?"[৩]

একই কবিতার অন্যত্র লিখছেন-

"... ... ওরে দাদা,
শহর হচ্ছে রাক্ষুসে এক গোলকধাঁধা
তাই বলে কি সেখানে যেতে নেই?"

আধুনিক বাংলা কবিতার পথিকৃৎ ঈশ্বর গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯) কলকাতার 'ইয়ং বেঙ্গল' ছেলেদের ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন- "সোনার বাঙাল করে কাঙাল ইয়ং বাঙাল যত জনা।"[৪]

কলকাতা চিরকালই কবি সাহিত্যকের ভাবজগতের বিষয় হয়ে আসছে। তার সুদীর্ঘ প্রবহমানতায় নানা রূপবদলের মধ্য দিয়ে এ শহর কালস্রোতে এগিয়ে চলেছে। এই শহরের সংকট সংগ্রাম সংস্কৃতি মানবজীবন সব উপকরণ আত্মসাৎ করে নিয়ে গড়ে উঠেছে সাহিত্য। কবি নীরেন্দ্রনাথের (১৯২৪-২০১৮) রচিত কবিতায় কলকাতা শহরের নান অভিব্যক্তির প্রকাশ আছে। নিজের জীবনের ছ'বছর বয়স থেকে কলকাতাকে দেখেছেন। দীর্ঘ জীবনের নানা অভিজ্ঞাতার তিনি সাক্ষী। প্রস্তুত আলোচনায় কলকাতা শহর কবি নীরেন্দ্রনাথের কবিতায় কতখানি জায়গা জুড়ে আছে, তার মূল্যায়ন করা হয়েছে। নীরেন্দ্রনাথের প্রথম দিককার কবিতায় কলকাতা শহরের উল্লেখ পাওয়া যায় না। সেখানে বাংলার প্রকৃতি, তাঁর ফেলে আসা দিনের চালচিত্র ও কিছু রোমান্টিক অভিনিবেশ লক্ষ্য করা যায়।

এক্ষণে আমরা কবির রচিত সে-সব কবিতার দিকে নজর ফেরাব যেখানে কোনো না কোনো ভাবে কলকাতা শহরের কথা উল্লিখিত হয়েছে। যেমন-

'ফলতায় রবিবার' ('অন্ধকার বারান্দা', প্রথম সংস্করণ ১৯৬১, কাব্যের অন্তর্গত) কবিতাটিতে শহরে না যাবার প্রসঙ্গ আছে। কারণ হিসেবে বলা হয়েছে-

"শহরে প্রচণ্ড ভিড়, অকারণ তুমুল চিৎকার,
নগ্ন নিয়নের বাতি। শহরে ফিরব না কেউ আর।"[৫]

বলা বাহুল্য এ শহর কলকাতা। শহরের কোলাহল ত্যাগ করে প্রকৃতির খোলা পরিবেশে, নদীর তীরের মুক্ত বাতাস সেবন করা শ্রেয় মনে করেন কবি।

'রাজপথে কিছুক্ষণ' 'নক্ষত্র জয়ের জন্য' (১৯৬৯) কাব্যের একটি কবিতা। এখানে অফিসের এক ছাপোষা কর্মচারীর অসহায়তার কথা ব্যক্ত হয়েছে। একজন সচেতন নাগরিক দপ্তের এসেছেন কলকাতা থেকে কৈম্বাটুর পর্যন্ত বাস চলাচল করানো যায় কি না তা জানতে। এ নিয়ে দপ্তর কর্মীর উষ্মা সরাসরি প্রকাশ পেয়েছ। কারণ কর্মীটি এত সাধারণ ও ক্ষমতাহীন যে তাঁর পক্ষে এত বড় সব কাজের খবর রাখা নিতান্ত বাতুলতা। শহরের রাজনৈতিক মহলের কর্তাব্যক্তিরা যে-সকল কাজের ধান্দায় ফেরেন, তাঁর মতো সাধারণ মানুষের পক্ষে সে-সবের হদিশ রাখা অসম্ভব।

" ...আমি
নেহাতই একজন ছাপোষা লোক,
টাইমের ভাত খেয়ে অফিস যাই,
অবসর-টবসর পেলে ছোট মেয়েটাকে নামতা শেখাই।"[৬]

এ কাব্যের 'বাতাসি' কবিতায় সন্তানহারা পিতৃর অসহায়তা তথা দিশেহারা অবস্থার চিত্র আছে। পিতার কণ্ঠে উচ্চারিত আর্ত ডাকের কারণ কী, সে-কথা জানার কোনো উপায় নেই। অথচ এমন আকছার ঘটছে কত ঘটনা। তার কেবল সংকেত থেকে আসল কথাটা উদ্ধার করা অসম্ভব হয়ে ওঠে। কবি বলছেন-

"গল্পের সবটা আমি পাব না নাগালে।
শুধু শুনে যাব। শুধু এখানে ওখানে,
জনারণ্যে, বাতাসের ভিতরে, হাটেমাঠে,
অথবা ফুটপাথে, কিংবা ট্রেনের জানলায়
টুকরো-টুকরো কথা শুনব, শুধু শুনে যাব।"[৭]

'নক্ষত্র জয়ের জন্য' বইয়ের ভিন্নস্বাদের একটি কবিতা 'কিচেন গারডেন'। কবিতাটিতে কলকাতা শহরে শাক-সবজির ফসল ফলে ওঠার বিবরণ আছে। উত্তর-দক্ষিণ সমস্ত কলকাতা জুড়ে এই আবাদ দেখে কবি চমৎকৃত বোধ করছেন। গোলাপের চাষ দরিদ্র শহরবাসীর কাছে শৌখিনতা।

"এখন চিচিঙ্গে, লাউ, ঢ্যাঁড়শের উদ্দেশ্যে ধাবিত
জনতাকে ফেরানো যাবে না।"[৮]

'কলকাতার যীশু' (১৯৬৯) কাব্যের একটি কবিতা 'মধ্যরাতে, ঘুমন্ত শহরে'। এই কবিতায় নিদ্রা-নিমগ্ন কলকাতার চিত্র বর্ণিত আছে। তাতে বলা হয়েছে, ইন্দিরা বলে কাউকে ভীষণ জোরে ডাকা হলে সেই শব্দে পরিপার্শ্বের চিত্র বদলে যেতে থাকে। বৃদ্ধেরা, যাদের ঘুম কম হয়, তারা উৎকর্ণ হলেন। শিশুরা ঘুমের মধ্যে কেঁদে উঠল। এবং দালানবাড়ির জানলাগুলো এক এক করে খুলে গেল। এই নৈশচিত্র কলকাতার। কবি লিখছেন-

"মধ্যরাতে পৃথিবীর তীব্রতম ডাক তাই দেয়ালে-দেয়ালে
প্রতিহত হতে-হতে
অর্থহীন হয়ে যায়।
যাকে ডাকা, সে আসে না,"[৯]

রাতের বেলা কাউকে ডেকে সাড়া না-পাওয়ার চিত্র শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের (১৯৩৩-১৯৯৫) একটি কবিতায়ও প্রশস্তি লাভ করতে দেখি, পরবর্তী কালে। কবিতাটির নাম 'অবনী বাড়ি আছো'। 'ধর্মে আছো জিরাফেও আছো' (প্রথম প্রকাশ- আশ্বিন, ১৩৭৫) কাব্যে কবিতাটি সন্নিবিষ্ট আছে। কবিতার সেই প্রবাদপ্রতিম উচ্চারণ-

"দুয়ার এঁটে ঘুমিয়ে আছে পাড়া
কেবল শুনি রাতের কাড়ানাড়া
অবনী বাড়ি আছো?"[১০]

এই নাগরিক জীবনের সম্পর্ক ও সম্পর্কহীনতার পাঠ আমাদের বিষণ্ণ করে। জীবন নির্বাহের এ এক ব্যাধি। নিরাময়ের উপায়হীন অস্বস্তিকর অবস্থা।

এ কালের প্রধান ভাষ্যকার কবি শঙ্খ ঘোষ (১৯৩২-২০২১) তাঁর 'সকাল দুপুর সন্ধ্যা' কবিতায় শহরের বিবর্ণ চিত্র অঙ্কন করেছেন।

"আঁকিবুকি গলি, পথ, দোকান-পসার, ছোট সিঁড়ি
অন্ধকার ভিজে ঘর কুকড়ে থাকে মলিন ভিখিরি
... ...
কী ভাষা, পিপাসা তার মেটেনি মেটেনি তার কোনোদিন-

সমস্ত দুহাত ভ'রে এ শহর ফিরে চায় ঋণ,"[১১]

'কলকাতার যীশু' (১৯৬৯) কাব্যের 'অন্য আকাশের দিকে' কবিতায় মুক্ত আকাশ হারানোর ছবি কবি অঙ্কিত করলেন। একটি চিলের খোলা আকাশে উড়ে বেড়ানোর আনন্দ ও স্বাধীনতার সুখ কবিকে নস্টালজিক করে তোলে। কবি সেই মুক্ততা আর খুঁজে পান না কলকাতা শহরে। বলছেন-

"কলকাতায় আছি। তবু মাঝে-মাঝে মনে হয়,
আর-কোথাও আছি।
এক-এক সময়
ফুটপাথ-বাজার-বস্তি ধসে পড়ে,
চতুর্দিকে
সমস্ত কঠিন হর্ম্য ঝাপসা হয়ে দূরে সরে যায়"[১২]

এই কাব্যের 'মাঝে মাঝে এই রকম' কবিতায় চিত্তের রূপবদলের কথা লিখেছেন কবি। জীবনের নানা অভিঘাতে মানুষের চিত্ত নানা ভাবে বিচলিত হয়। আনন্দে, বিরাগে, বিমূঢ়তায় তার নানা স্ফূরণ আমাদের সচকিত করে। বিশেষত চিত্ত যখন অকারণ পুলক অনুভব করে, তখন তার ভাবগতিক একটু অন্যরকম হয়। সেই কথাই এই কবিতাটিতে লিখলেন-

"শ্যামবাজারের পাঁচমাথায় দাঁড়িয়ে
প্রত্যেককে ডেকে-ডেকে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে : কেমন আছেন?"[১৩]

অন্যত্র 'জমেছে নতুন রঙ্গ' কবিতায় নগর কলকাতার জনমানসের চিত্র আছে। নাগরিক মন কী ভাবে দৈনন্দিন নানা আর্থসামাজিক ওঠাপড়ায় নিজেদের বদলে ফেলে, তা-ই কবি রঙ্গ হিসেবে দেখছেন। অস্তিত্বের এই রূপবদল কদর্য লাগে। এই মানুষগুলো সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ নয়। এঁরা সমাজে নানা পেশায় যুক্ত আছে। এবং নিজের স্বর্থবুদ্ধির পাকদণ্ডীতে বাঁধা পড়ে আছে। কবির ভাষায়-

"একজন বস্তুত-ভাঁড় মনস্বীর ভূমিকায় মঞ্চে নেমেছেন।
মুখশ্রী পালটিয়ে যায় দ্রুত পরিবর্তিত আলোকে,
কয়েকটি চতুরকে যায় চেনা।
জমেছে নতুন রঙ্গ কলকাতায়, দর্শকের চোখে
পলক পড়ে না।"[১৪]

বলা বাহুল্য নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর বিখ্যাত কাব্যগুলির একটি এই 'কলকাতার যীশু'। এই কাব্যের নাম কবিতাটির দিকে লক্ষ্য করা যাক। কবিতাটিতে একটি সদ্য হাঁটতে শেখা শিশুর কথা আছে। যে-শিশু টালমাটাল পায়ে কলকাতার গাড়ি-ঘোড়া-লোক-লস্করের ভিড়ে-ঠাসা রাস্তা পার হচ্ছে। তাই দেখে কবির মনে অভূতপূর্ব ভাবানুভূতির সৃষ্টি হয়েছে।

"ভিখারি-মায়ের শিশু,
কলকাতার যিশু,
সমস্ত ট্রাফিক তুমি মন্ত্রবলে থামিয়ে দিয়েছ।"[১৫]

নির্বোধ শিশুটির প্রথম পথচলা, এবং উদ্যত মৃত্যু সম্পর্কে উদাসীনতা, এই দুটি বিষয়ের দিকে কবি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষিত করেন। সদ্য হাঁটতে শেখার আনন্দ, বিশ্বকে হাতের মুঠোয় পেতে চাওয়ার আকাঙ্ক্ষা, শিশুটির এই অভিব্যক্তি মনোমুগ্ধকর। পুরাকালের যিশুর নির্ভীক নির্মল মানবহৃদয় এই কবিতায় ব্যঞ্জিত হয়েছে। কলকাতা শহরের এই ছবি বাংলা কবিতায় কবি নীরেন্দ্রনাথের হাতে এক অবিনশ্বর রূপ লাভ করেছে।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর শ্রেষ্ঠ এবং বহুপঠিত কাব্য 'উলঙ্গ রাজা' (১৯৭১)। এই কাব্যে সাতের দশকের উত্তাল কলকাতার দিনগুলির চিত্র ও তার নানা ব্যঞ্জনা উপস্থাপিত হয়েছে। যেমন 'লক্ষ্মণ-বিচার' কবিতায় সরাসরি প্রতীক ও রূপকের আড়ালে এক ভায়বহ অসুস্থার কথা আমরা জানতে পারি, যে-অসুখ কোনোদিন সারবার নয়। শহরে দাঙ্গা শুরু হলে, সেই সাতের দশকের কলকাতা কী রূপ পেত তার ছবি এই কবিতায় কবি তুলে ধরলেন।

"রাস্তায় নেমে বাস পেলুম না,
কোথায় কী গণ্ডগোল হয়েছে, তাই
বাস-ট্রাম বন্ধ।
বাতাসে অ্যামোনিয়ার ঝাঁঝালো গন্ধ,
কাছে কোথাও আচমকা একটা পটকা ফাটতেই
কটাকট কটাকট তার জবাব পাওয়া গেল।"[১৬]

'কাঁচের গুঁড়ো' কবিতায়ও অনুরূপ ছবি ফুটে উঠেছে। সারা শহর জুড়ে রক্ত ঝরছে। গুলি ও বোমা ফাটেছ। তার শব্দ শোনা যাচ্ছে। এ সবের মধ্যেও মানুষের বাঁচার স্বপ্ন, নৈমিত্তিক জীবন কীভাবে অটুট থাকছে, সেই জীবনতৃষ্ণার এক মরমী রূপ কবি অপূর্ব ছন্দে গেঁথে তোলেন।[১৭] অনুরূপ 'ভয় করলেই ভয়' কবিতাটি। এখানে কবি অন্যত্র বেরিয়ে পড়ার কথা বললেন। যাবতীয় হিংসা, মৃত্যু, অপঘাতের ভয়কে উপেক্ষা করেই বেরিয়ে পড়ার কথা বলা হয়েছে। কেননা তা না-হলে কোথাও পৌঁছানো যাবে না। কবি লিখেছন-

"জানি, রাস্তা এখন ক্রমেই আরও তেতে উঠছে।
উঠুক।
ঘরই জ্বলে, রাস্তা কে আর জ্বালায়?
দেখতে পাচ্ছি,
ওদের চোখে বিন্দু-বিন্দু রক্ত ফুটছে।"[১৮]

'উলঙ্গ রাজা' কাব্যের উল্লখযোগ্য কবিতা 'কবিতা ৭০'। কবিতাটি শুরু হয়েছে এভাবে-

"এক-একটা কবিতা যেন সুতানুটি-গোবিন্দপুরের
রাত্রিকে ফিরিয়ে আনে।
এক-একটা কবিতা যেন অকস্মাৎ
টান্ মেরে হটিয়ে দেয় ময়দানের সবুজ গালিচা।
... ...
এক একটা কবিতা গিয়ে ফেটে পড়ে চৌরঙ্গী পাড়ায়।
বৃক্ষেরা আমূল কাঁপে, ভয়ার্ত পাখিরা
ঝাঁকে-ঝাঁকে
বিপন্ন আশ্রয় ছেড়ে রাত্রির আকাশে উড়ে যায়।"[১৯]

এখানে কবিতার ইতিহাস ও সময়ের ইতিহাস মাখামাখি হয়ে আছে রূপকে আর প্রতীকে। সুদীর্ঘকালের কলকাতা শহরের কাব্যচর্চার ইতিহাস এখানে প্রচ্ছন্ন। তার পরিবর্তে কালের পদচিহ্ন কবি আঁকতে চাইলেন। নিরবচ্ছিন্ন জীবনচলার ছন্দ ও তার উত্তাল তরঙ্গ নানা আর্থসামাজিক অভিঘাতে কীভাবে উচ্ছল হয়ে উঠেছিল কলকাতার বুকে, তারই রূপরেখা এই কবিতা।

'হ্যালো দমদম' কবিতায় কলকাতা শহরের বন্যার ভয়াবহতার কথা পাই। পিচ বাঁধানো শহরের রাস্তা জলে থই থই করছে। পায়ের কাছে মাছেরা খেলা করছে। চারদিকে নালা-নর্দমা ডুবে কালো জল ধেয়ে আসছে। অসহায় শহরের মানুষ উদ্ধার পাবার জন্যে নির্দিষ্ট দপ্তরে অহরহ ফোন করে চলেছ, 'হ্যালো দমদম'। বাড়ির শখের জুঁইলতা জলের তলায় তলিয়ে গেল। কখন রেসক্যু বোট আসবে। অসুস্থ জ্বরাক্রান্ত মেয়ের শোবার ঘরে ঢুকে পড়ে নেড়ি কুকুর ও একরাশ কচুরিপানা।

নীরেন্দ্রনাথের তিনটি কাব্য 'খোলামুঠি' (১৯৭৪) 'কবিতার বদলে কবিতা' (১৯৭৬) 'আজ সকালে' (১৯৭৮) এই তিনটি কাব্যগ্রন্থে কলকাতার প্রসঙ্গ নেই। এবং 'পাগলা ঘন্টি' (১৯৮১) কাব্যের প্রথমদিকের কবিতাগুলিতে নগরায়নের কথা আছে। সুভাষ মুখোপাধ্যায় (১৯১৯-২০০৩) তাঁর 'চিরকুট' (১৩৫৭) কাব্যর 'স্বাগত' কবিতায় যেমন বলেছিলেন-

"গ্রাম উঠে গিয়েছে শহরে-
শূন্য ঘর, শূন্য গোলা,
ধানবোনা জমি আছে পড়ে।"[২০]

অনুরূপ নীরেন্দ্রনাথের 'হাইওয়ে' কবিতায় দেখি মেদিনীপুরের ছেলে গোবিন্দ দেউলিয়াবাজারের চায়ের দোকানে কাজ করে। ধান চাষের বদলে পদ্ম আর রজনীগন্ধার চাষ করা হয় জমিতে। এবং তা ট্রাকবোজাই হয়ে চলে আসে কলকাতায়। 'পাগলা ঘন্টি' কাব্যের একটি কবিতা 'পেঁচি'। এটি ব্যঙ্গাত্মক কবিতা। শহুরে জীবনে যে ভাঁড়ামি গাঁজিয়ে উঠেছে দিনের পর দিন, কবি তার প্রতি কটাক্ষ করেছেন। এখন শহরে মাতলামি বিক্রি হয়। যে শুঁড়ি, তার সাক্ষীকেই প্রতিভা বলে গণ্য করা হয়। অথচ এমনটা তো হবার কথা ছিল না। তাই কবি শ্লেষ ভরে বলে উঠেন- "মাতলামি প্রতিভা বলে গণ্য হচ্ছে কলকাতা শহরে।"[২১] কিন্তু 'পাগলা ঘন্টি' নামক নাম কবিতাটি কলকাতার যাবতীয় অপূর্ণতার ছবি এঁকে রেখেছে। পাগলা ঘন্টি যেমন চলমান জীবনকে টলিয়ে দেয়, নাড়িয়ে দেয় বিষম ভাবে, ঠিক তেমনি কবি এমন একজনকে আহ্বান করেন কলকাতার রূপ পালটে দিতে। কলকাতার সবকিছু সুন্দর করে দিতে। কবির ভাষায়-

"বলি, চলো, কলকাতায় যাই,
পাতাল-রেলের জন্যে মাটি খুঁড়ি, সুড়ঙ্গ বানাই"[২২]

কিন্তু কবির আহ্বান ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়, কেননা ভোরের হাওয়া পাগলা-ঘন্টির মতো জানান দিয়ে যায়, যাকে কবি খুঁজছেন, সে সুবর্ণরেখা নদীর বাঁকে মিলিয়ে গেছে। আর কোনোদিন ফিরে আসবে না। তবু আশাবাদী কবি তাকে ডেকে চলেছেন।

'ঘর-দুয়ার' কাব্যটি ১৯৮৩ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। এই কাব্যের 'পুরনো ছবি' কবিতায় মূলত পুরনো কলকাতার ছবি কবি অঙ্কন করেছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য গ্যাসের বাতি জ্বালাবার জন্যে মই কাঁধে ফেরা লোকটি, হাঁড়িমাথায় মালাই বরফ বিক্রেতা, ঝাঁকা মাথায় বেলফুল বিক্রেতা থেকে আরম্ভ করে যতসব ফিরিওলার স্মৃতি কবি ফুটিয়ে তুলেছেন। আরও একজন রয়েছে যাকে আর ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। সেই বিশ্বাস সেই ভালবাসা, যার অভাব চিরকাল কলকাতায় থেকে যাবে, দিনবদলের ঢেউয়ে যা সত্যি হারিয়ে গেছে। এমনই রসের আরেকটি কবিতা 'জয় কালী'। কবিতাটিতে পঁয়তাল্লিশ বছর পুরনো বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাতের রোমাঞ্চের কথা আছে। বাল্যকালের স্মৃতি সব আছড়ে পড়েছে দুজনের মনে ও প্রাণে। যে-কলকাতা শহরকে বিশ্রী স্বাদহীন মনে হত, তা নিমেষে স্মৃতির সবুজ রঙে মোহময় হয়ে ওঠে। এতদিন যে-জীবন সাংসারিক দায়-দায়িত্বে ন্যুব্জ হয়ে পড়েছিল তা মুহূর্তেই প্রাণ পেয়ে ওঠে। আকাশে পুজোর গন্ধ, কলকাতার গঙ্গা থেকে ছুটে আসে হাওয়া।[২৩]

আবার 'সময় বড় কম' (১৯৮৪) কাব্যে জীবনের উপলব্ধি, বার্ধক্যের বোধ এসবই মূল সুর। তবে বিক্ষিপ্ত ভাবে হলেও কলকাতার কিছু অনুষঙ্গ আছে। যেমন একটি কবিতা 'লালদিঘিতে বৃষ্টি' এখানে আকাশের উৎপ্রেক্ষায় কবি স্নানরতা রমণীর সৌন্দর্যের রূপ এঁকেছেন। শেষে সমাসোক্তি অলঙ্কারের প্রয়োগ কবিতাটিকে মনোমুগ্ধকর করে তুলেছে।[২৪] অপর একটি কবিতা 'ভুল ভাঙছে'। এতে কবি সমকালীন কলকাতার এক কদর্য রূপ তুলে ধরলেন। রাজনৈতিক বাতাবরণ ও সামাজিক ব্যবস্থার এক অবক্ষয়িত রূপ আমরা এই কবিতাটিতে দেখতে পেলাম। কবিতাটিতে বলা হয়েছে কিছু মানুষ মুখোশধারী, তারা লোকের জীবন ছারখার করে দিয়ে উল্লাস করে। মনুষ্যত্বের এই অবমাননার প্রতি কবি সোচ্চার হয়েছেন।[২৫]

কবির অপর একটি কাব্য 'যাবতীয় ভালবাসাবাসি' (১৯৮৬)। এর প্রথম কবিতা 'আশ্বিনে'। কবিতাটিতে কলকাতার বউবাজারের প্রসঙ্গ আছে। কবি লিখেছেন, বাজারের দোকানগুলিতে লুট হয়ে গেছে সোনা। সেই সোনারঙ দিয়ে আশ্বিন আলপনা আঁকে। এই বইয়ের নাম কবিতা 'যাবতীয় ভালবাসাবাসি'-তে আবার কলকাতার দেবশিশু সেই 'যিশু'র প্রসঙ্গ এসেছে। মধ্যরাতে মানসপটে কবি দেখতে পান আধডোবা জাহাজের মতো শহরটা ডুবছে। ঝড়-ঝাপটে কেঁপে উঠছে লক্ষ-লক্ষ তারা। আর তাঁর চোখের সামনে ভাসতে থাকে সেই দেবশিশু। সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক কবিতা 'দুঃখী নগর'। এই নগর কলকাতা। সে বেহুলার মতো দুঃখী। অনন্ত নৈরাশ্যের মধ্যে ভাসতে-ভাসতে, বেহুলা যেমন স্বর্গে ঢুকে পড়েছিল, কলকাতাও সুন্দর আলোর বৃত্তে ঢুকে পড়ে।[২৬] কলকাতাকে কেউ কেউ মিছিলের নগর বলেছেন কবি তাঁদের সঙ্গে একমত নন। কেউ বলেছেন দুঃস্বপ্নের নগর, তাতেও কবির সম্মতি নেই। তাঁর ভাষ্য এই নগর দুঃখী নগর এবং বড় অভিমানী।

নীরেন্দ্রনাথের রচিত পরবর্তী কাব্য 'ঘুমিয়ে পড়ার আগে' (১৯৮৭)। এখানে বেশ কয়টি কবিতায় কলকাতার প্রসঙ্গ বিবৃত হয়েছে। 'কালবৈশাখী' কবিতায় কলকাত শহরে ফুটপাথের কিনারে হেঁটোয়-কাঁটা গাছের কথা আছে। কবি বলছেন-

> ''বিকেলবেলার শহর এখন শুয়ে আছে
> বেহুঁশ জ্বোরো রুগির মতো।''[২৭]

এই কাব্যের উল্লেখযোগ্য কবিতা 'পদ্মাপার থেকে গঙ্গাতীরে'। কবি বলছেন তাঁর শৈশব কেটেছে পদ্মাপারে আর যৌবন কেটেছে গঙ্গাতীরে, কলকাতায়। তিনি দেখলেন, জঞ্জালের ভার টানতে-টানতে মস্ত একটা নদী কীভাবে নর্দমা হয়ে গেল। অথচ এই নদী পদ্মাপারের মতো পাগলের ন্যায় খেপে ওঠে না। শহরের স্ট্র্যান্ড রোডের ভিকিরি ও চোর, শ্মশানের ডোম, নিষিদ্ধ পল্লির নাগরিক ছাড়া গোটা কলকাতা শহর যখন ঘুমে তখন নদী নিজে সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠে আসে। তখন নদীকে রহস্যময়ী নারী মনে হয়।[২৮]

'জঙ্গলে এক উন্মাদিনী' কাব্যের (১৯৮৯) নামকবিতাটি বড় মারাত্মক বিষয় নিয়ে আমাদের সামনে উপস্থিত। কবিতাটিতে একটি উন্মাদিনীর অসহায়তার গল্প পরিস্ফুট হয়েছে। কোনো শহুরে দুর্বৃত্ত কর্তৃক উন্মাদিনী গর্ভবতী হয়েছে এবং সন্তানপ্রসব করেছে রাস্তায়। জনৈক বিজনচন্দ্র বিশ্বাসের বাড়ির সামনে পাগলির জীবনের নির্মমতাকে উপভোগ করার জন্যে সমবেত জনতাকে পাগলি যখন প্রাগৈতিহাসিক ক্রোধে নিঃশেষ করে দিতে উদ্যত, তখনই জনতা বিকট হাস্যে ফেটে পড়ছে। অথচ বিজনবাবুর বাড়ির কাজের মানুষ পারুলবালা ওই পাগলির নবজাতককে কোলে করে ঘরে নিয়ে গেল। আর যেতে যেতে সমবেত শহুরে জনতার উদ্দেশ্যে একদলা থুথু ছিটিয়ে বলে গেল, বাঘসিংহ-ভরা জঙ্গলে পাগলদেরও নিস্তার নেই। কলকাতা শহরের এমন কদর্য রূপ বাংলা কবিতায় চোখে পড়ে না।[২৯]

'আয় রঙ্গ' (১৯৯১) কাব্যের একটি স্মৃতিভারাতুর কবিতা 'প্রাণ-ভোমরা', তাতে কবি তাঁর দাদুর কথা স্মরণ করে লিখছেন-

"... যে থাকতে চায়
মুরগি রাখার ঘরে,
গ্রাম ছেড়ে সেই উজবুক যায়
কলকাতা শহরে"[৩০]

এ নিয়ে কবি সহমত হতে পারেননি। কলকাতার প্রাণ-ভোমরা কোথায় তা তিনি জানেন। ঘুপচি ঘরের ভালবাসায়। এই কাব্যে 'কলকাতা-৩০০' এই নামে একটি কবিতা রয়েছে। এটি কলকাতা শহরের তিনশো বছর পূর্তি কীভাবে পালিত হচ্ছে তারই বিবরণ। কবিতাটি তির্যক। কিছুটা ব্যঙ্গের ভঙ্গিতে লেখা। দেখানো হচ্ছে কলকাতা শহর প্রথম জন্মদিনে কেমন ছিল। তাতে উঠে আসছে সুতানুটি গ্রামের গভীর অন্ধকার রাত্রি। মশা উড়ছে, শিয়াল ডাকছে, ফিরে এসেছে গোবিন্দপুরের আতঙ্ক। আর শ্মশানকালী পুজোর নরবলির দৃশ্য।

অন্যদিকে 'চল্লিশের দিনগুলি' প্রকাশিত হয় ১৯৯৪ সালে। কাব্যের নামে প্রকাশ তার বিষয়বস্তু। চল্লিশের দশকের উত্তাল ঘটনার তাপ সরাসরি এই কাব্যের কবিতাগুলিতে লেগেছে। নামকবিতাটি কাব্যের প্রথমেই স্থান পেয়েছে। তাতে কবি জানাচ্ছেন কলকাতা শহরের সঙ্গে তিরিশের দশকের সূচনায় তাঁর পরিচয় ঘটেছিল। তখনই কলকাতা নিজেকে আমূল পালটে ফেলার জন্যে তৈরি হচ্ছিল। উনচল্লিশে মহাযুদ্ধ, বিয়াল্লিশে আন্দোলনের আগুন, মেদিনীপুরের ধান খেতে ভাসছিল চাষির লাশ, কলকাতার ফুলবাগানে উড়ছিল শ্মশানের ছাই, আর তেতাল্লিশে দুর্ভিক্ষ। জাপানি বোমার ভয়ে কলকাতা ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল। কী দেখায়নি কলকাতা শহর-মন্বন্তরে এক স্কুল বালিকা তার টিফিনের খাবার উপুড় করে দিচ্ছিল ভিকির মায়ের ঝুলিতে। ছেলের হাত থেকে ভাতের থালা কেড়ে নিয়ে হাসছিল উন্মাদিনী মা।[৩১]

'কবি চেনে, সম্পূর্ণ চেনে না' (২০০১) গ্রন্থের দু-চারটি কবিতায় কলকাতার প্রসঙ্গ এসেছে। একটি কবিতার নাম 'চোখের সামনে'। এই কবিতায় চলমান কলকাতার দৃশ্যপট চিত্রিত হয়েছে। কবিতাটি বিবরণধর্মী। এখানে নেই কোনো ইশারা। ভাবের ব্যঞ্জনা নেই। শুধু একটা ছবি আমরা দেখতে পাই। এক ট্রাফিক পুলিশ গ্রাম থেকে আসা বছর চারেকের ছেলেক কাঁধে তুলে রাস্তা পার করে দিচ্ছে। সঙ্গে তার গ্রামবাসিনী মা। যে কলকাতা শহরে প্রথম এসেছে। এবং যানবাহনের ঘোর চক্করে পড়ে রাস্তা পার হতে পারছিল না। শহুরে পুলিশের কর্তব্যজ্ঞান এবং মানবিক দায়িত্বের প্রতি কবির সস্নেহ দৃষ্টিপাত আমাদের চকিত করে। কারণ শহুরে মানুষ যেন এ দৃশ্য দেখতে অভ্যস্ত নয়। কবি লিখছেন-

"খালি পায়ে
জড়সড় হেঁটে চলেছে মাথায়-ঘোমটা,
কপালে-তেল-জবজবে-সিঁদুরের-টিপ,
পরনে-জংলা-শাড়ি,
সম্ভবত এই শহরে সদ্য-আসা একটি
বউ-মানুষ"[৩২]

এ কাব্যের অন্য একটি কবিতা 'স্মৃতির গলিতে আজও'। এখানে কবি স্মৃতিকাতর। কলকাতার পুরনো যাপনচিত্রের দৃশ্যপট তাঁর মানসপটে ভেসে ওঠে। এখন কলকাতা শহরের বুকে সেইসব পুরনো ছবি চোখে পড়ে না। যারা মই কাঁধে করে সন্ধার প্রাক্কালে বাতিদানে বাতি জ্বালাত তারা কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে। এখন এত নিয়ন বাতি জ্বলে। তবুও কলকাতার আঁধার কাটে না। এই আঁধার ব্যঞ্জনার্থক। শহুরে জীবনের নির্মম ব্যাধি হল সম্পর্কহীনতা। তাই ঘন আঁধারের মতো মানবজীবনে চেপে বসেছে। কবি তাই সততই স্মৃতিকাতর হয়ে পড়েন। কবি লিখছেন-

"পুরনো সমস্ত-কিছু যেমন ক্রমশ চলে যায়,
ঝাঁকা নিয়ে তুমিও গিয়েছ, ফিরিওলা।
সকালে মাকখন গোলি, দুপুরে খাগড়াই
বিষ্টুপুরী বাসন-বিক্রেতা,"[৩৩]

'কবি চেনে, সম্পূর্ণ চেনে না' এই নাম কবিতাটি বড় মধুর। জীবনের বিষণ্ণ কিছু দিক কবি এখানে তুলে এনেছেন। কবিতাটি সাতটি পর্বে সাজানো। প্রথম পর্বে মিতুল নামের এক শিশুর কথা আছে। শিশুটি অসুস্থ। কলকাতার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছে। বেশিদিন বাঁচবে না সে। সবাই মিতুলকে গোপাল বলে ডাকে। বিশেষত হাসপাতালের নার্সরা। তিনমাস ধরে সে ওখানে আছে। সবাইকে মাতিয়ে রেখেছে। অথচ তার দেহে বইছে মৃত্যুর বিষ। আনন্দ ও বেদনার যুগল মূর্তি দেখে আমাদের বিষাদ জাগে। দ্বিতীয় পর্বে একটি কিশোরীর কথা আছে। যে-কিশোরী স্বভাব-চঞ্চল। হাসিতে আড্ডায় আশপাশের সকলকে মাতিয়ে রাখে। এখন সে ছাতিমগাছের তলায় বাসন্তিক ছায়া মেখে পরীক্ষার পড়ার খাতায় শেষবারের মতো চোখ বুলিয়ে নিচ্ছে। তার এই হালফিল ভাবগম্ভীরতায় তাকে চেনা যাচ্ছে না। কবি ওকে দেখতে বলছেন। তৃতীয় পর্বে আছে একটি কিশোর বালকের কথা। বালকটি দরিদ্র। দেউলিয়াবাজারে চায়ের দোকানে কাজ করত। সপ্তাহখানেক হল সে কাজ হারিয়েছে। এখন সে রূপনারানের কূলে বসে থাকে আনমনা। জীবনের কোন মানে খোঁজে কেই-বা জানে। লোকে এই ছেলেটিকে না চিনলেও কবি ওকে চেনেন।

কবিতাটির চতুর্থপর্বে আছে সত্তর দশকের কলকাতার রাজনৈতিক পরিস্থিতির ভয়াবহতার গল্প। এখানে এক দুঃখী মায়ের ছবি অঙ্কন করেছেন কবি। মা জানলার শিক ধরে মাঝরাতে দাঁড়িয়ে আছেন। কখন তাঁর ছেলে এসে মাঝরাতে মা বলে ডেকে ওঠে, এই প্রতীক্ষায়। কবি লিখছেন-

"যে-ছেলে ভাত খেতে বসেছিল, তাকে বন্ধুরা কোথায়
ভাতের থালার থেকে তুলে নিয়ে গেল,
কেন নিয়ে গেল, কাকে মুক্ত করতে এই
মুক্তির দশকে,"[৩৪]

এ প্রসঙ্গে আমাদের মনে পড়ে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের (১৯১৯-২০০৩) 'যত দূরেই যাই' (১৯৬২) কাব্যের 'কেন এল না' কবিতাটির কথা, সেখানেও স্তব্ধ অপেক্ষার করুণ চিত্র আছে। একটি ছেলে বাবার আগমনের প্রতীক্ষায় আছে। বাবা এলে পুজোর জামা কেনা হবে। কিন্তু অফিস থেকে বাবা সারাদিন এলো না। মায়ের দুশ্চিন্তা। গৃহকাজে ভুল হচ্ছে উদ্বেগের আতিশয্যে। শেষমেষ ছেলেটি বাবার খোঁজে গলির মোড়ের দিকে এগিয়ে গেলো। তার তর সইছিল না। একটু পরে একটি কালো গাড়িতে বন্দুকধারী লোকজন এলো। বোমাবাজি চললো। মাঝরাতে বহু মৃত্যুর পাশ কাটিয়ে বাবা বাড়ি ফিরে এলেও, ছেলে কিন্তু এলো না। এই সেই মুক্তির দশকের কলকাতার চলচিত্র। সাধারণ মানুষের জীবনের কোনো নিশ্চয়তা ছিল না। কবির ভাষায় চিত্রটা এরকম-

"তারপর অনেক রাত্তিরে
বারুদের-গন্ধে-ভরা রাস্তা দিয়ে
অনেক অলিগলি ঘুরে
মৃত্যুর পাশ কাটিয়ে
বাবা এল।
ছেলে এল না।।"[৩৫]

নীরেন্দ্রনাথ-পরবর্তী কবিতায়ও কলকাতা প্রবল ভাবে উপস্থিত। এ প্রসঙ্গে আমাদের মনে পড়ে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'আমি ও কলকতা' কবিতার কথা। যাতে কবি লিখেছেন-

> "কলকাতা আমার বুকে বিষম পাথর হয়ে আছে
> আমি এর সর্বনাশ করে যাবো-
> আমি একে ফুসলিয়ে নিয়ে যাবো হলদিয়া বন্দরে"[৩৬]

এ ছাড়া আছে সুনীলের সেই বিখ্যাত কবিতার (নীরার অসুখ) পংক্তি-

> "নীরার অসুখ হলে কলকাতার সবাই বড় দুঃখে থাকে"[৩৭]

সমকালের আরেক কবি শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর 'মত্ত অবস্থায় রচিত' নামক কবিতায় লিখেছেন-

> "রাত বারোটার পর কলকাতা শাসন করে চারজন যুবক"[৩৮]

এমন অজস্র উদাহরণ টানা যায়। কলকাতা এমনই স্বপ্ন ও দুস্বপ্ন বুনে দিয়েছে কবিদলের মনোজগতে। নীরেন্দ্রনাথ তাঁর 'গল্পের বিষয়' নামক কবিতায় তিন বন্ধুর এক আলোচনা পেশ করেছেন, যাতে মূল বিষয় হল কলকাতা শহর। এই শহরের বিভিন্ন স্থানে তিনজনের হামেশাই দেখা হয়। বলছেন গল্পের বিষয় এখনকার মানুষ বুঝবে না। মধ্য কলকাতার এক গলি যা কিনা রাত বারোটায় সবুজ আলোয় সাঁতার কাটতে-কাটতে স্বপ্ন দেখত হরেক রকম। কথা হয় অঘ্রানের ঘোলাটে আকাশ নিয়ে। যে আকাশে শীলেদের বাড়ির ছেলের বিয়ের রাত্তিরে আলোর নেকলেস পরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমরা বঝতে পারি কবির মনোভূমি জুড়ে একটা বিরাট বড় জায়গা নিয়ে আছে প্রিয় কলকাতা শহর।

তথ্যসূত্র:

১। দাশ, জীবনানন্দ। শ্রেষ্ঠ কবিতা, ভারবি (২য় সংস্করণ, সপ্তম মুদ্রণ)। ১৯৮৮, কল-৭৩, পৃ. ৫৮।

২। দত্ত, মাইকেল মধুসূদন। একেই কি বলে সভ্যতা? (সম্পাদনা- নির্মলেন্দু ভৌমিক)। শিলালিপি, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ (২য় মুদ্রণ) ২০০০, পৃ. ২।

৩। চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ। রূপ-কাহিনী (কবিতা সমগ্র-৩)। আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ (চতুর্থ মুদ্রণ), ২০১৬, কল-৯, পৃ. ৫৭-৫৯।

৪। বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার। বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত। মডার্ন বুক এজেন্সি প্রা.লি.,(পরিবর্ধিত সংস্করণ পুনর্মুদ্রণ ২০১১, কলকাতা-৭৩, পৃ. ২৬৫।

৫। চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ। অন্ধকার বারান্দা (কবিতা সমগ্র-১)। আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ (দশম মুদ্রণ), ২০১৫, কল-৯, পৃ. ৭৯।

৬। চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ। কবিতা সমগ্র-৩। (সংযোজনা) আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ (চতুর্থ মুদ্রণ), ২০১৬, কল-৯, পৃ. ৩০৩।

৭। চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ। নক্ষত্র জয়ের জন্য (কবিতা সমগ্র-১)। আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ (দশম মুদ্রণ), ২০১৫, কল-৯, পৃ. ১৬৭।

৮। তদেব, পৃ. ১৮৮।

৯। চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ। কলকাতার যীশু (কবিতা সমগ্র-১)। আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ(দশম মুদ্রণ), ২০১৫, কল-৯, পৃ. ২১৩।

১০।https://dn790009.ca.archive.org/0/items/ShaktiChattopadhyayerSreshthoKobita/ShaktiChattopadhyayerSreshthoKobita.pdf পৃ. ৪১

১১। https://dn721903.ca.archive.org/0/items/in.ernet.dli.2015.454580/2015.454580.Kabitasangraha.pdf, পৃ. ৫৯।
১২। চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ। কলকাতার যীশু (কবিতা সমগ্র-১)। আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ, (দশম মুদ্রণ) জুলাই, ২০১৫, কল-৯, পৃ. ২২০।
১৩। তদেব, পৃ. ২২৬।
১৪। তদেব, পৃ. ২২৮।
১৫। তদেব, পৃ. ২৩০।
১৬। চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ। উলঙ্গ রাজা (কবিতা সমগ্র-২)। আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ, (সপ্তম মুদ্রণ) মে, ২০১৬, কল-৯, পৃ. ১২।
১৭। তদেব, পৃ. ২৫।
১৮। তদেব, পৃ. ২৬।
১৯। তদেব, পৃ. ২৯-৩০।
২০।https://ia601305.us.archive.org/25/items/in.ernet.dli.2015.303156/2015.303156.Subhas-Mukhopadhyayer.pdf. পৃ. ৫৯
২১। চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ। পাগলা ঘন্টি (কবিতা সমগ্র-২)। আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ, (সপ্তম মুদ্রণ) মে, ২০১৬, কল-৯, পৃ. ১৬৫।
২২। তদেব, পৃ. ১৬৭।
২৩। চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ। ঘর-দুয়ার (কবিতা সমগ্র-২)। আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ, (সপ্তম মুদ্রণ) মে, ২০১৬, কল-৯, পৃ. ২১২।
২৪। চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ। সময় বড় কম (কবিতা সমগ্র-৩)। আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ, (চতুর্থ মুদ্রণ) এপ্রিল, ২০১৬, কল-৯, পৃ. ১৬।
২৫। চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ। সময় বড় কম (কবিতা সমগ্র-৩)। আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ, (চতুর্থ মুদ্রণ) এপ্রিল, ২০১৬, কল-৯, পৃ. ২৫।
২৬। চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ। যাবতীয় ভালবাসাবাসি (কবিতা সমগ্র-৩)। আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ, (চতুর্থ মুদ্রণ) এপ্রিল, ২০১৬, কল-৯, পৃ. ১১৯।
২৭। চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ। ঘুমিয়ে পড়ার আগে (কবিতা সমগ্র-৩)। আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ, (চতুর্থ মুদ্রণ) এপ্রিল, ২০১৬, কল-৯, পৃ. ১৫৩।
২৮। তদেব, পৃ. ১৫৫।
২৯। চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ। জঙ্গলে এক উন্মাদিনী (কবিতা সমগ্র-৩)। আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ, (চতুর্থ মুদ্রণ) এপ্রিল, ২০১৬, কল-৯, পৃ. ১৯৫।
৩০। চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ। আয় রঙ্গ (কবিতা সমগ্র-৩)। আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ, (চতুর্থ মুদ্রণ) এপ্রিল, ২০১৬, কল-৯, পৃ. ২৬১।
৩১। চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ। চল্লিশের দিনগুলি (কবিতা সমগ্র-৪)। আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ, ডিসেম্বর, ২০০০, কল-৯, পৃ. ১১-২২।
৩২। চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ। কবি চেনে, সম্পূর্ণ চেনে না (কবিতা সমগ্র-৫)। আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ, ডিসেম্বর,২০১৮, কল-৯, পৃ. ১৬।

৩৩। চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ। কবি চেনে, সম্পূর্ণ চেনে না(কবিতা সমগ্র-৫)। আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ, ডিসেম্বর, ২০১৮, কল-৯, পৃ. ১৭।

৩৪। চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ। কবি চেনে, সম্পূর্ণ চেনে না (কবিতা সমগ্র-৫)। আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ, ডিসেম্বর, ২০১৮, কল-৯, পৃ. ২৫।

৩৫। https://bangodarshan.com/ratan/stock/JATO_DUREY_JAAI.pdf, পৃ. ২৬।

৩৬।https://boierthikana.com/static/pdf/kobita/Sunil%20Gangopadhyay%20er%20Shreshtho%20Kobita.pdf পৃ. ২৩।

৩৭। তদেব, পৃ. ৪৮।

৩৮।https://bangodarshan.com/ratan/stock/SARATKUMAR_MUKHOPADHYAYER_SHRESTHA_KABITA.pdf,পৃ. ৭